গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আবিস্কার ভাষা। সে হয়ে উঠেছে যুগ যুগান্তরব্যাপী প্রসারিত এক সেতুবন্ধ। ভাষা বয়ে চলা নদীর মতো। ভাষার নদীটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে প্রধানত দুটো ধারায়— ১. লেখ্যভাষা, ২. কথ্যভাষা। লেখ্যভাষার একটি সর্বজনীন রূপ থাকলেও কথ্যভাষার তেমন কোন সর্বজনীন রূপ নেই। মানুষ যেমন বিভক্ত হয়ে গেছে তেমনি বিভক্ত হয়ে গেছে মানুষের ভাষাও। অধিকাংশ মানুষ বসবাস করে গ্রামে। অধিক সংখ্যক লোকের ভাষা কথ্যভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও লোকভাষা। এই সব মানুষের কথনরীতি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, শব্দ প্রয়োগ ভাষাকে এক আলাদা মাত্রা দান করেছে। বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষাও তেমনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বাল্যকাল থেকেই উত্তর দিনাজপুর জেলার অধিবাসী হওয়ার সুবাদে এই জেলার বাংলা কথ্যভাষার একটি স্বতন্ত্ররূপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে উত্তরে দার্জিলিং জেলা, দক্ষিরে মালদা জেলা, পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর ও পশ্চিমে বিহার রাজ্যের উপস্থিতি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ইসলামপুর মহকুমাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৯ সালে বিহার রাজ্য থেকে পৃথক করে ইসলমাপুর মহকুমাটিকে পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৯ সালের আগে ইসলামপুর মহকুমার মাতৃভাষা ছিল উর্দু। পরবর্তীকালে বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষা পাশাপাশি চলতে থাকে। পাশ্ববর্তী বিহার রাজ্যের অতি নৈকট্যের ফলে হিন্দি, বিহারী, ভোজপুরি ইত্যাদি ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরের প্রচলিত বাংলা মান্য চলিত, রাজবংশী, শেরশাবাদিয়া, বঙ্গালী, সূর্যাপুরি ও মাড়োয়ারীদের ভাষার সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি করেছে এক অদ্ভুত ভাষা পরিবেশ—যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক। এর পাশাপাশি ইংরেজী ভাষার প্রবল প্রভাব আঞ্চলিক ভাষার রূপান্তরে বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই সৃষ্টি হচ্ছে অদ্ভুত শব্দ ও নতুন ভাষার। পশ্চিম বাংলার উত্তর দিনাজপুর ও বিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকা যেমন ইসলামপুর, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়ামোড়, ডালখোলা ও বারসই ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত মিশ্রভাষা। এই মিশ্রভাষা আমাদের সঞ্চার করেছে আকর্ষণ, বৃদ্ধি করেছে আগ্রহ ও জাগিয়েছে কৌতূহল, তাই আমরা গবেষণা করার তাগিদ অনুভব করেছি।

অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে গবেষণা করেছেন সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা' শিরোণামে। 'উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অভিবাসিত চলন বিল অঞ্চলের কথ্যভাষা' নিয়ে গবেষণা করেছেন জীবন কুমার ঘোষ। এছাড়া দু-একটি প্রবন্ধে উত্তর দিনাজপুরের কথ্যভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষা নিয়ে এ যাবৎ কোনো গবেষণা কাজ হয়নি। আমাদের গবেষণা সেই শূন্যতা পূরণ করবে বলে আশা রাখছি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে আমরা মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। এছাড়াও প্রথমে নিবেদন ও ভূমিকা এবং সবশেষে উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট অংশ যুক্ত করা হয়েছে। আমরা প্রত্যেক অধ্যায়ে যা যা আলোচনা করেছি তার একটি সংক্ষিপ্তসার নিচে তুলে ধরা হল।

প্রথম অধ্যায়

উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ পরিচয়

(General Introduction of Uttar Dinajpur District)

এই অধ্যায়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও জনতাত্ত্বিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল 'পশ্চিম দিনাজপুর' বিভক্ত হয়ে 'উত্তর দিনাজপুর' জেলার জন্ম হয়। এই জেলার আয়তন হল ৩১৪২ বর্গ কিমি। অবস্থান ২৫°১০´ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮৭°৪৫´ থেকে ৮৮°৩৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। পলি মৃত্তিকা দ্বারা জেলার মৃত্তিকা শৃঙ্খলাবদ্ধ। কুলিক, নাগর ও মহানন্দা এই জেলার প্রধান নদ-নদী। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩°-৪২°c লক্ষ্য করা যায়। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪°-৮°c দেখা যায়। জেলার স্বাভাবিক বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬৫-২২৫ সেমি। জেলার মোট জনসংখ্যা ৩০,০০,৮৪৯ জন। জনমণ্ডলী প্রধানত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী সমাজ দ্বারা গঠিত। ৪টি পৌরসভা, ৯টি ব্লক, ৯৮টি গ্রাম ও ১৫১৩ টি মৌজা নিয়ে এই জেলা গঠিত। জেলার প্রধান ভাষা বাংলা। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই জেলা বেশ সমৃদ্ধ। জেলার সামাজিক পরিকাঠামো অনুন্নত কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির পরিকাঠামো উন্নত। অর্থনৈতিক ভাবে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলার অন্যতম হল উত্তর দিনাজপুর জেলা ধোকড়া ও মোখা শিল্পের জন্য এই জেলা প্রসিদ্ধ। ধান, পাট, গম, সর্ষা, ডাল, ভুট্টা ও তিসি প্রধান ফসল। জেলার প্রধান ভাষা রাজবংশী। ইসলামপুর মহকুমায় একটি বড় অংশের জনগণ উর্দু ও হিন্দিভাষী। ফলে তৈরী হয়েছে বিমিশ্র ভাষার উপযুক্ত

পরিবেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonology)

এই অধ্যায়ে কথ্যভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি তালিকা, স্বরধ্বনির অবস্থান, উচ্চারণ অনুযায়ী স্বরধ্বনির প্রকৃতি ও পরিবর্তন, দ্বি-স্বরধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন-ধ্বনির আগম, ধ্বনিলোপ, ধ্বনির রূপান্তর, ধ্বনির স্থানান্তর দেখানো হয়েছে। সংবৃত, অর্ধসংবৃত, অর্ধ-বিবৃত ও বিবৃত স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ নানাভাবে রূপান্তরিত হতে দেখা গেছে। আদ্য 'অ' ধ্বনির পর 'ই' ও 'উ' ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—হইবে > হোবে, খই > খোই। শব্দে দ্বিতীয় ব্যঞ্জনে 'আ' ধ্বনি থাকলে আদ্য 'অ' সর্বদাই 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—লম্বা > নাম্বা, কথা > কাথা, মহারাজা > মাহারাজা। মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখে 'অ' 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কাফন > কাফুন, সালন > শালুন। আদ্য 'অ' 'অ্যা' রূপে উচ্চারিত হবার প্রবণতা বেশি। যেমন—কত > ক্যাতলা, কখন > ক্যাখুন। 'আ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হলেও কথ্যভাষায় প্রায় সবর্ত্রই হ্রসস্বর রূপে উচ্চারিত হয়। আদ্য 'উ' পরবর্তী 'আ' ধ্বনির প্রভাবে 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—সুতা > সোতা, মুঠা > মোঠা। অ, আ, ই, এ, উ, ও প্রতিটি স্বরধ্বনিই 'অ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। মধ্যমদস্থিত 'ক' ঘোষীভবনের ফলে কখনো 'গ' হয়েছে। যেমন—শাক > শাগ, সকল > সগল। মধ্য পদস্থিত মহাপ্রাণিত 'ক' 'খ' হয়েছে। যেমন—পুকুর > পৈখোর, দোজক > দুজখ। পদমধ্যে ও পদান্তে 'চ' মৃদু 'স' রূপে উচ্চারিত হয়। 'চ' এর উচ্চারণ ইংরেজী ch বা tch এর মতো না হয়ে অনেকটা ts -এর মতো হয়। যেমন—কোরিচে > কোইসে, করিচু > কইসু। আদ্য 'র' অনেক ক্ষেত্রেই 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—রং > অং, রোসন > অসুন। আবার পদের আদিতে 'র' লুপ্ত হতে পারে। যেমন—রূপা > উপা, রাক্ষস > অ্যাইখ্খস। দ্বিমাত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—চিরুণি > চির্‌ণি, বামুনি > বাম্‌নি। সকারীভবন ও ল-কারীভবন এই কথ্যভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। চ, ছ, জ, ঝ ইত্যাদি উষ্মধ্বনিগুলি 'স' ও 'শ'-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন—গাছ > গাস, করিচু > কোরিসু। 'ন' ও 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন—নসিব > লশিব, করলা > কৈল্‌ল্যা।

তৃতীয় অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

এই অধ্যায়ে রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া, ক্রিয়ারকাল, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ক্রিয়া, অস্ত্যর্থক ক্রিয়া, নঞর্থক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নামধাতু, শ্রেণি বিভাগ সহ বিভিন্ন কারক ও কারক বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, সর্বনাম প্রভৃতির রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও লিঙ্গ, বচন, বিশেষ্যমূলক রূপিম, বিশেষ্যমূলক পদগঠন, বিশেষণমূলক পদ গঠন, পদাশ্রিত নির্দেশক, যৌগিক পদ, সমাসবদ্ধ শব্দ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'ইতে' ক্রিয়াবিভক্তির পরিবর্তে 'বা' ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—খাবা (খেতে), করবা (করতে)। নামধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে, যেমন—মাপাইব্যা, গুনাইব্যা, উড়াইব্যা ইত্যাদি। ফারসি উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত হয়েছে, যেমন—বেজ্জত, গরহজম ইত্যাদি। উপসর্গের পাশাপাশি অনুসর্গের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, যেমন—হোতে, দিয়্যা, কইর‍্যা, মোইদ্দে, লাইগ্যা, থাইক্যা ইত্যাদি। মান্য চলিতের মতো এই কথ্যভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উত্তম পুরুষে সর্বনাম পদের এক বচনে মি, মুই, হামি বহুবচনে হামরা; মধ্যম পুরুষের একবচনে তি, তুমি বহুবচনে তোরা, তোমসাক্, তোমসার; প্রথম পুরুষের একবচনে উ, ও, ওয়াক, ওয়ার বহুবচনে অরা, ওয়ারা প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল ই, উ, ইটা, উটা, ওটা, ইলা, ঐলা, উখান্‌টা, ঐগ্‌ল্যা প্রভৃতি। অনির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল— কে, কায়, কুছু, কেহু প্রভৃতি। প্রশ্নবাচক সর্বনামগুলি হল—কায়, কি, কোন্‌ডা, কেনে, ক্যায়সে, কুন্‌টি, কেৎখুন, এলায়, কিউ, এন্না, ওন্না, কেখুন প্রভৃতি। ট, টা, ড, ডা, খান, টো প্রভৃতি একবচন নির্দেশক শব্দ, যেমন—গাছট, জমিখান, কিতাবটো ইত্যাদি। গালা/লা হল বহুচবচন নির্দেশক, যেমন—লোকলা, কোদুগালা প্রভৃতি। এই কথ্যভাষায় নতুন নতুন শব্দদ্বৈতও ধ্বন্যাত্মক শব্দ পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্যরীতি (Syntax)

এই অধ্যায়ে বাক্যের পদ সংস্থান, সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি, বিশেষণ পদের

ব্যবহার রীতি, অব্যয় পদের ব্যবহার রীতি, গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, ভাবগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ, বাচ্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণ (Traditional Grammer) -এর সূত্র মেনে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য কথ্যভাষায় পদসংস্থানের দু-ধরণের রীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি হল, কর্তা (subject) + কর্ম (object) + ক্রিয়া (verb) অর্থাৎ SOV। আর দ্বিতীয়টি হল, কর্তা (subject) + ক্রিয়া (verb) + কর্ম (object) অর্থাৎ SVO। বাক্যে ব্যবহৃত নতুন নতুন অব্যয় পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সম্বন্ধবাচক অব্যয়—আর, ফের; প্রতিপাক্ষিক অব্যয়—লেকিন; ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়—নাইলে; অবস্থাত্মক অব্যয়—যুদি, তে; ব্যবস্থাত্মক অব্যয়—তানে, লাইগ্যা, দাস্তি; প্রশ্নাত্মক অব্যয়— কে, কি, কায়, কেনে; অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয়—হা, জি, আইজ্ঞা প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে। জটিল বাক্যে সংযোজক অব্যয় রূপে যেমন, অরুরসা, আগর, তো, তেন, তে, তব, যখুনা-তখুনা, যেইটা- সেইটা প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে। যৌগিক বাক্যে সংযোজক অব্যয় রূপে তো, ফের, ইসলিয়ে তনে, লেকিন, আর, ত্যাইলে, ন্যাইলে প্রভৃতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই কথ্যভাষায় যৌগিক বাক্যের ব্যবহার তুলনামূলক কম ও সরল ও জটিল বাক্যের ব্যবহার অধিকতর, বাচ্যগত দিক থেকে কর্ম ও ভাব বাচ্যের তুলনায় কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ বেশি।

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)

এই অধ্যায়ে সংস্কৃতমূল শব্দ, দেশি শব্দ, আগন্তুক শব্দ ও মিশ্র শব্দের উপবিভাগের তালিকা এবং কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য কথ্যভাষায় এমন কিছু শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা চলিত বাংলায় নেই; এমনকি তাদের উৎসমূল নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। হিন্দি ছাড়াও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দ আলোচ্য কথ্যভাষায় প্রয়োগ হতে দেখা যায়। বিদেশিমূল শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দার্থতত্ত্ব (Semantic)

এই অধ্যায়ে শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ-আলংকারিক প্রয়োগ, সৌজন্য ও সুভাষণ

রীতি, সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা, পরিবেশ ও সমাজগত পরিবর্তন, সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ পার্থক্য, বিশিষ্টার্থক শব্দের অর্থ পার্থক্য দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা-অর্থের বিস্তার, অর্থের সংকোচ ও অর্থের সংশ্লেষ কথ্যভাষার নিরিখে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঢপের চপ-মিথ্যে বলা (ভাবার্থ)। এখানে ঢপ-ধাপ্পাবাজ ও চপ-ফাঁপা। এখানে আলংকারিক প্রয়োগ হিসাবে 'ঢপের চপ' ব্যবহার করা হয়। এই কথ্যভাষায় সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। রাত্রিবেলা নারীরা হলুদকে 'রং', চুনকে 'দৈ' ও শাপ (সাপ) -কে 'লতা', 'পুকা' বলে থাকেন। 'বেরছানি' শব্দের অর্থ হল মহিলা বা নারী। শব্দটি শুধুমাত্র এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এটি পরিবেশ ও সমাজগত পরিবর্তন। 'মিজ্‌জাফর' (মীরজাফর) শব্দটি ব্যক্তি নাম পরিহার করে বিশেষ পরিচয় দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলে 'মিজ্‌জাফর' হল বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দ। এখানে শব্দের অর্থের বিস্তার ঘটেছে। 'ঘরেল' শব্দটি হিন্দি 'ঘড়িয়াল' থেকে উৎপন্ন যা প্রাণী বিশেষ। কিন্তু কথ্যভাষায় 'ঘড়েল' বলতে খুব চালাক ধূর্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। এখানে শব্দার্থের সংক্রম ঘটেছে।

সপ্তম অধ্যায়

সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ (A Sociolinguistic Analysis)

এই অধ্যায়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচ্য কথ্যভাষার জাতিভেদে ভাষা পরিবর্তন-দেশীয়, পলিয়া, কাপালি, নমঃশূদ্র, বাদিয়া, বাঙ্গাল; বয়সভেদে ভাষা পরিবর্তন-নবীন, মধ্যবয়স্ক, প্রবীণ; সামাজিক শ্রেণিভেদে ভাষা পরিবর্তন-কর্মভেদে বা পেশাভেদে ভাষা পরিবর্তন; অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে ভাষা পরিবর্তন-উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত; শিক্ষা ভেদে ভাষা পরিবর্তন-নিরক্ষর, স্বল্প-শিক্ষিত, শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত; লিঙ্গভেদে ভাষা পরিবর্তন-নারীর ভাষা, পুরুষের ভাষা; ধর্মভেদে ভাষা পরিবর্তন : পরিবেশ-পরিস্থিতি ভেদে ভাষা পরিবর্তন; অন্যান্য সূত্রে ভাষা পরিবর্তন- শ্রোতাভেদে ভাষা পরিবর্তন, উপলক্ষ্য ভেদে ভাষা পরিবর্তন, কৃত্রিমভাষা ভেদে ভাষা পরিবর্তন প্রভৃতি সামাজিক মাত্রাভেদে ভাষা পরিবর্তন বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। বয়সভেদে ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রবীণ, মধ্যবয়স্ক ও নবীন—এই তিনটি প্রজন্মের ভাষার নমুনাকে পাশাপাশি রেখে তাদের ধ্বনিগত, শব্দগত ও বাক্যগত পার্থক্যগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে—

মান্য — ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রবীণ — ওয়াক ইধার বুলায় লিয়ে ওস্।

মধ্যবয়স্ক— ওয়াক এধার ডাকি লিয়ে অস্।

নবীন— অক্ ইহা ডাকে নিয়ে অস্।

পেশা-পরিবেশ ও পেশা সম্পর্কিত অনেক শব্দ ভাষায় অনুপ্রবেশ করে, তাই পেশা ভেদে ভাষা পরিবর্তন সংগঠিত হয়। যেমন—

ক. অফিসকর্মী— বস্ যা স্ট্রীকট্, আজই ফাইলটা রেডি করতে হবে।

খ. গ্যারেজকর্মী— সকালবেলাটা পাংচার হোইং গেল।

গ. সব্জি বিক্রেতা— যাঃ শালা বোহনির সুম্যা গণ্ডগোল হয়্যা গেল্।

ঘ. ভিক্ষুক— দুই দিন থিক্যা না খাইয়া আছি, বাবু দুইডা পয়সা দেন্ না।

ঙ. জেলে — আজ জালৎ বহুৎলা মাচ্ ধরা পড়িচে।

শিক্ষা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই শিক্ষা ভেদে ভাষা পরিবর্তন স্পষ্টত ধরা পড়েছে। যেমন—

ক. নিরক্ষর — বাও মি ক্যালকাত্তা যাবা চাছু।

খ. স্বল্প শিক্ষিত — বা হামি কলকাতা যাবা চাহাছু।

গ. শিক্ষিত — বাবা আমি কোলকাতা যেতে চাই।

ঘ. উচ্চশিক্ষিত — ড্যাড্ আমি ক্যালকাটা যেতে চাইছি।

নারীর ভাষার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। নতুন কিছু অনুসর্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—দিয়া (তারপর), ল্যগা (জন্য), লিয়া (নিয়ে), বাদে (জন্য) ইত্যাদি। নারীরা বাক্যের সঙ্গে একটি যোজিত প্রশ্ন (tag question) জুড়ে দেয়। আলো, কিলো, শোন্ লো, লো কণ্ঠে গেলি, কালা নাকিলা ইত্যাদি ভাবদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করে থাকে। ধর্মভেদে ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়কেই মূলত ধরা হয়েছে। ধর্মীয় শব্দ, পারিবারিক সম্পর্ক নির্দেশক শব্দ, নামকরণ, সম্বোধন, প্রত্যুত্তর, অভিবাদনসূচক শব্দ ও নৈকট্যসূচক বিভক্তি—মূলত এই সূত্রগুলোর ওপর ভিত্তি করেই ধর্মভেদে ভাষা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।